দুর্গাপুজো আমেরিকান কায়দায়

লেখকঃ সুব্রত মজুমদার

মনে আছে ছোটবেলায় নতুন বছর শুরু হওয়ার প্রথম থেকেই বসে থাকতাম দুর্গা পুজোর জন্য। মাকে জিজ্ঞেস করতাম, পুজো কবে? মা বলত, পাঁজি এখনো বেরোয়নি, বেরলে জানাব। পাঁজি বেরলে মা ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে বলত, এই দেখ পাঁচদিন পুজো। ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো মনে হত বড্ড দেরি করছে, ওই দিনগুলোতে পৌছতে। আমার শৈশবের কলকাতায় কাটানো প্রতিবছরের পুজোর ওই কটা দিন আজও মনে পড়ে ছবির মত। লক্ষ্যের থেকে উপলক্ষ বড় হয়ে উঠত আমার কাছে পুজোর সময়। নতুন কেনা জামা কাপড় আর বাটার জুতো বড় হয়ে উঠত পুজোর থেকেও। আমার পুজো শুরু হত বলতে গেলে ওই মহালয়ার গান শোনার পরের দিন থেকেই।

পুজোর সময় কলকাতা মনে হত একটা আস্ত পাগলখানা। সারা শহরটা মেতে উঠত ওই পাঁচটা দিন, ঝল্‌মল্‌ করত আলোয় আলোয়, ঢাকের বাদ্যি আর লাউড স্পিকারের কান ফাটানো হিন্দি সিনেমার গানে। ছোট থেকে বড় সবাইকে দেখতাম পাটভাঙ্গা নতুন জামা কাপড় পরে দলে দলে ঘুরছে পাড়া থেকে পাড়ায় ঠাকুর দেখার জন্য। কত রকমেরই না ঠাকুর, কত বড় আর কত রকমের তাদের সাজ। সব প্রতিমার মুখেই আমি একটা অদ্ভুত হাসি লক্ষ্য করতাম। প্যাণ্ডেল থেকে প্যাণ্ডেলে আমিও ঘুরে বেড়াতাম বন্ধুদের সঙ্গে। মনে হত এই প্রতিমাটা আগের দেখা প্রতিমাটার থেকে আরো ভাল, হাসিটা যেন আরো সুন্দর। পাঁচটা দিন মনে হত বড্ড কম, আরো বেশিদিন ধরে পুজো চলা উচিত। ভাবতাম বড় হয়ে আমি সব পালটে দেব। অঞ্জলি দেবার সময়ে পুরোহিতের পড়া মন্ত্রগুলো আমার কানে বাজত। সমস্ত পরিবেশটা মনে হত সুন্দর, নির্মল, পবিত্র আর জাগ্রত।

আমেরিকায় আমরা দুর্গাপুজোর অনেক সংশোধন করে নিয়েছি। লাইফ ইন দা ফাস্ট লেনের দেশে আমরা পাঁচ দিনের পুজোটাকে সেরে ফেলি দুদিনে। শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের সুবিধা মত ঠিক করে নিই কোন উইকেন্ডে আমাদের সব থেকে সুবিধা হবে পুজো করতে। এইবারের যিনি প্রেসিডেন্ট তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক আর কোন স্কুলের অডিটোরিয়াম ওই দুটো দিন খালি পাওয়া যাবে তার উপরেই আমাদের পুজোর দিন মোটামুটি নির্ভর করে। আমেরিকায় পুজোয় পাঁজির কোন প্রয়োজন হয়না। আমরাই ঠিক করি আমাদের পুজোর দিন।

আমাদের শহরের দুর্গাপুজো দেখতে গেলাম কয়েকদিন আগে। স্কুলের অডিটোরিয়ামে ঢুকে চাঁদা দিয়ে, থুড়ি প্রণামী দিয়ে বসলাম একটা চেয়ারে। দেখলাম আমার চেনা এক ডাক্তার ভদ্রলোক পুজো করছেন। একটু অবাক হলাম; পাশে বসা ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম নিচু স্বরে, "আচ্ছা যিনি পুজো করছেন উনি তো ব্রাহ্মণ নন, উনি পুজো করছেন কি করে? তাছাড়া উনি সংস্কৃতে লেখা মন্ত্রগুলোও ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারছেন না"। "তার মানে? পুরোহিত ব্রাহ্মণ হতে হবে এমন কোন কথা কোথাও লেখা আছে নাকি? আপনি আমায় দেখাতে পারেন? কতদিন আমেরিকায় আছেন? এত ব্যাক্‌ডেটেড হয়ে আছেন কেন? এবারে তো non-brahmin দিয়ে পুজো করালাম; পরের বারে আমরা ঠিক করেছি মহিলা পুরোহিতকে দিয়ে পুজো করাব। অনেকদিন ধরে এইসব discrimination চলে আসছে, আর আমরা এসব সহ্য করব না। আপনাদের মত লোকেদের জন্যেই আমাদের এত অবনতি। আর সংস্কৃত ভুল বলছে কিনা আপনি কি করে জানলেন? আপনি কি সংস্কৃতের মাস্টারমশাই? আর তাছাড়া যদি ভুল বলেও থাকে তো কি হয়েছে? ওটাতো এমনিতেও একটা obsolete language। আমরা ঠিক করেছি আমাদের ছেলে মেয়েরা যাতে বুঝতে পারে তার জন্য এবার থেকে English-এ ওই মন্ত্রগুলোকে translate করে বাচ্চাদের দিয়ে পড়াব"। ভদ্রলোক প্রায় আমাকে খেঁকিয়ে উঠলেন।

আমি আড়চোখে এদিক ওদিক তাকালাম, কেউ আমাদের কথা শুনতে পেয়েছি কিনা? দেখলাম অনেকেই মাদুর্গার দিকে না তাকিয়ে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি আর কথা বাড়ালাম না। ওনাকে বলতে পারলাম না, যে আমি এক সময়ে স্কুল থেকে কলেজে ওঠার পরীক্ষায় সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিলাম। আমার বাবা সংস্কৃতের মাস্টারমশাই ছিলেন। বাবা ভোর বেলায় নিজে উঠে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে পুজোর মন্ত্র উচ্চারণ করাতেন। ভুল উচ্চারণ করলে আমার কানমলা খেতে হয়েছে অনেকবার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভয়ে ভয়ে সরে পড়লাম ওনার পাশ থেকে।

একটা ফাঁকা চেয়ার দেখে বসে পড়লাম। চোখটা সরাসরি গিয়ে পড়ল প্রতিমার উপর। মাদুর্গা দশভুজা হয়ে পায়ের নিচে পড়ে থাকা অসুর নিধনে ব্যস্ত। ছেলে মেয়েরা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সব ঠিক আছে। এক মিনিটের জন্য আমার মনটা দৌড়তে শুরু করল, চলে গেল সোজা কলকাতায়, আমার সেই ছোটবেলার কলকাতায়, সেই পুজোর দিনগুলোতে – মাত্র এক মিনিটের জন্য। চোখটা খুললাম – আরে, এই প্রতিমাটা এত ছোট কেন? ছোট তো হবেই, কুমারটুলি থেকে আনাতে খরচা পড়ে না? মনে আছে আমি একবার কথাটা তুলেছিলাম। আমায় বলা হল – যত বড় প্রতিমা তত খরচা। ফেলো কড়ি মাখো তেল। আপনি পয়সা ছাড়ুন আপনাকে চল্লিশ ফুট লম্বা প্রতিমা এনে দেব।

মনে আছে কলকাতায় পুজো শেষ হলে প্রতিমার বিসর্জন হত। ঘরে ঘরে বাড়ির বাইরে মাটির প্রদীপ জ্বালানো হত। মাটির প্রতিমা জলে ফেলে দেওয়া হত। মা গঙ্গা তাঁর বুকে টেনে নিতেন সবাইকে। দলে দলে লোক সেখানেও যেত প্রতিমা বিসর্জন দেখার জন্য। ঢাকের বাজনা এত জোরে বাজত যে সারা বাড়ি কেঁপে উঠত। আমার বুকের ভেতরটাও কেঁপে উঠত। আমরা বলতাম ঠাকুর আবার এসো। ঠিক এইসময় আমার দুচোখ জলে ভরে উঠত। আমি জানতাম পরের বারের ঠাকুর হবে সম্পূর্ণ নতুন। মায়ের হাসি পরের বারে কেমন হবে দেখার জন্য আমি অপেক্ষায় থাকতাম।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমেরিকায় প্রতিমা বিসর্জন দেবার দরকার নেই। প্রতিমা এখানে আসেন ও চলে যান প্যাকেজ ডিল হয়ে। একবছরের জন্য তিনি প্যাকেজের মধ্যে বন্দিনী হয়ে থাকবেন। State-of-the-art technology-র সাহায্যে তাঁকে রাখা হবে এমন ভাবে যাতে আলো বাতাস ঢুকে তাঁর চেহারার কোন পরিবর্তন না করতে পারে। আচ্ছা মায়ের কি ইচ্ছা করে না নতুন চেহারা নিয়ে, নতুন হাসি নিয়ে প্রতিবছর আমাদের দেখা দিতে?

আমি মা কে বললাম, "চিন্তা কোরো না মা। কুছ পরোয়া নেই। আমরা এখান থেকে একটা মাউসের ক্লিকে দেশের যে কোন জায়গায় বিজয়ার মিষ্টি নিমেষের মধ্যে পাঠাতে পারি। পাঠাতে পারি ই-মেল করে বিজয়ার সুন্দর দেখতে কার্ড, ঢাকের আওয়াজ সমেত, যার সঙ্গে থাকবে অবিকল প্রদীপের মত দেখতে ছবি। তুমি বুঝতেও পারবে না আসল না নকল। আর হাসির কথা বলছ? ওটাও কিছু নয়। ওটা হল মাইন্ড সেটের ব্যাপার। মাইন্ড সেটটা শুধু তোমায় একটু চেঞ্জ করতে হবে। এই ধরো না, লিওনার্দোর আঁকা মোনালিসার ছবি। গত প্রায় পাঁচশ বছর ধরে লোকের মন জয় করে আসছে কি না? একই হাসি অথচ যত দিন যাচ্ছে তত লোকের ভাল লাগছে। তোমার হাসি মোনালিসার হাসির থেকে কম নয় বরঞ্চ অনেক অনেক বেশি"।